PANCHAKOTesSAYS
ISSN : 0976-4968
Vol-14, No.-2, November 2023

স্বর্ণকুমারী দেবীর ভ্রমণকাহিনি ‘পত্র’ : প্রেক্ষিত সামাজিক ও ধর্মীয় রীতিনীতি

বরুণ মণ্ডল [1*]

[1*] সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, পঞ্চকোট মহাবিদ্যালয়, সরবড়ি, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ
ই-মেইলঃ barun.970@rediffmail.com

সারাংশ: বাংলার সমাজ ও সাহিত্যে অন্যতম প্রগতিশীল এবং ব্যক্তিত্বময়ী নারী স্বর্ণকুমারী দেবী। নিপুণ পর্যবেক্ষণ শক্তির অধিকারিনী এই লেখিকার সোলাপুর ভ্রমণের অভিজ্ঞতাকেন্দ্রীক রচনা ‘পত্র’ শিরোনামাঙ্কিত রচনাটি। বিভিন্ন বিষয়ের বর্ণনার পাশাপাশি সোলাপুর ভ্রমণকালে সোলাপুরের মানুষজনের সামাজিক ও ধর্মীয় রীতি-নীতির নিখুঁত পরিচয় দান করেছেন।সেখানকার অপরিচিত মানুষেরাও লেখিকাদের সঙ্গে দেখা হলে নমস্কার করেছেন এবং লেখিকাও তাদের প্রতি নমস্কার জানিয়েছেন। সেখানকার মানুষের অভ্যর্থনার ধরনটিও তুলে ধরেছেন।পুনার দেশীয় বাড়ি ঘরের বর্ণনায় তিনি সেখানকার মানুষজনের অতি সাধারণ জীবন যাপনের চিত্র সুন্দরভাবে তুলে ধরতে পেরেছেন। বর্ণনা থেকে আমরা সেই সময়ের সোলাপুরে ধর্মীয় পরিবেশটি কেমন ছিল তা সহজেই বুঝতে পারি।

সূচক শব্দ: পত্ররীতি, সামাজিক রীতিনীতি, ধর্মীয় রীতিনীতি

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্বর্ণকুমারী দেবী একটি উল্লেখযোগ্য নাম। ঠাকুরবাড়ির প্রগতিশীল পরিবারে জন্মগ্রহণ ও বেড়ে ওঠার কারণে স্বর্ণকুমারীর মধ্যে সেই প্রগতিশীল মানসিকতা ও যৌক্তিক মনন যেমন ছিল তেমনি নেতৃত্ব দানের ক্ষমতা প্রবল ছিল। ভারতের জাতীয় রাজনীতিতেও এই মহীয়সী নারী সরাসরি যুক্ত ছিলেন।[১] নারীদের উন্নতির জন্য ‘সখিসমিতি’ প্রতিষ্ঠা করা তাঁর অন্যতম কৃতিত্ব। নদীয়ার বিখ্যাত জমিদার পরিবারের সন্তান জানকীনাথ ঘোষালের সঙ্গে ১৮৬৮ সালে তাঁর বিবাহ হয়। যেহেতু স্বর্ণকুমারী দেবীর পরিবার ছিল পিরালী ব্রাহ্মণ, তাই জানকীনাথ ঘোষালকে ত্যজ্যপুত্র হতে হয়েছিল। স্বামীর প্রগতিশীল মানসিকতাও স্বর্ণকুমারীকে সমৃদ্ধ করেছিল।

ঠাকুরবাড়ির এই প্রগতিশীল নারী বাংলা সাহিত্যের নানা শাখায় স্বচ্ছন্দ পদচারণা ঘটিয়েছেন। গল্প, উপন্যাস, নাটক যেমন লিখেছেন তেমনি বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যের ধারাটিও তাঁর হাতে সমৃদ্ধ হয়েছিল। ‘দীপ নির্বাণ’, ‘ফুলের মালা’, ‘মালতি’, ‘কাহাকে’-র মত বিখ্যাত উপন্যাস রচনার পাশাপাশি ‘রাজকন্যা’, ‘দিব্য কমল’-এর মত নাটক লিখেছেন তেমনি এই প্রগতিশীল নারী একাধিক ভ্রমণ কাহিনি রচনা করেছেন।

স্বর্ণকুমারী দেবীর অন্যতম উল্লেখযোগ্য ভ্রমণ কাহিনি ‘পত্র’ শিরোনামাঙ্কিত রচনাটি। সোলাপুর ভ্রমণের অভিজ্ঞতাকেন্দ্রীক এই রচনাটিতে মোট সাতটি পত্র রয়েছে। ১৮৯২ সালের শ্রাবণ মাসে সোলাপুরে থাকাকালীন সময়ে তিনি এটি রচনা করেছেন। ১২৯৮ বঙ্গাব্দের আশ্বিন, কার্তিক, পৌষ, মাঘ এবং ১২৯৯ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ও অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পত্ররীতিতে রচিত এই রচনাটি

বাংলা সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য ভ্রমণ বিষয়ক রচনা। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে এই রীতিতে রচিত ভ্রমণ সাহিত্যের সূচনা বহু পূর্বেই হয়েছিল। Sir George Dallas ভ্রমণে গিয়ে তাঁর মাকে যে সমস্ত চিঠি লিখেছিলেন সেগুলির সংকলন 'The India Guide; Or, Journal of a Voyage to the East Indies in the Year MDCCLXXX'(1785) –নামে গ্রন্থটি।[২] আবার Samuyel Butler নিউজিল্যান্ড ভ্রমণে গিয়ে পরিবারের লোকজনকে যেসব চিঠি লিখেছিলেন সেগুলির সংকলনগ্রন্থ 'A First Year In Canterbury Settlement' (1863)। এটিও একটি উল্লেখযোগ্য ভ্রমণসাহিত্য।[৩] অষ্টাদশ শতাব্দীতে মূলতঃ পারিবারিক পত্রই ভ্রমণসাহিত্যের বিকাশকে ত্বরান্বিত করেছিল। [৪]

ব্যক্তিস্বাতন্ত্রময়ী এই নারী যেখানে গেছেন সেখানকার পরিবেশ পরিস্থিতি, মানুষজনের রীতিনীতি, সামাজিক ও ধর্মীয় আচার-আচরণ নিখুঁতভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন তাঁর রচনার মধ্যে । 'পত্র' রচনাটিতেও তাঁর সেই বিশ্লেষণী দৃষ্টির প্রকাশ ঘটেছে। আমরা জানি একজন ভ্রমণ সাহিত্যিক যেখানে যান সেখানকার মানুষজনের সামাজিক রীতিনীতিকে বিশেষভাবে তুলে ধরেন। শুধু পুরুষের রচিত ভ্রমণসাহিত্যেই নয় নারীদের রচিত ভ্রমণসাহিত্যেও সমাজের নিখুঁত বিশ্লেষণের ছবি ধরা পড়ে।[৫] স্বর্ণকুমারী দেবীও সেই সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করেছেন। তাই সোলাপুর ভ্রমণকালে সোলাপুরের মানুষজনের সামাজিক রীতি-নীতির নিখুঁত পরিচয় দান করেছেন। সেখানকার অপরিচিত মানুষেরাও লেখিকাদের সঙ্গে দেখা হলে নমস্কার করেছেন এবং লেখিকাও তাদের প্রতি নমস্কার জানিয়েছেন। মতিবাগ যাবার পথে তাঁতিদের ছোট ছোট ছেলে মেয়েরাও লেখিকাকে সুন্দরভাবে সেলাম করেছে। আবার ওই পথেই প্রহরারত সিপাহীরা সৈনিকী প্রথায় অভিবাদন জানিয়েছে।

আবার সোলাপুরের মানুষজনের কাছে ফুলের গুরুত্ব কতখানি তাও লেখিকার দৃষ্টি এড়ায়নি। শুধুমাত্র সম্ভ্রান্ত নারী পুরুষ নয় এখানকার সাধারণ মানুষ যেন ফুলের সাজসজ্জা করে। মেয়েদের খোঁপাতে ফুলের মালা জড়ানোর পাশাপাশি লেখিকা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করেছেন তা হল সোলাপুরের পুরুষেরাও মেয়েদের মত মাথার পিছন দিকে খোঁপা বাঁধে এবং তাতে' ফুলহার' জড়ায়। যদিও এই দৃশ্যটি বাঙালি নারী স্বর্ণকুমারীর দৃষ্টিতে ঠিক মানানসই মনে হয়নি। এর পাশাপাশি তিনি সেখানকার চিত্ররীতির উল্লেখ করেছেন। মহারাষ্ট্রীদের কাছে ছবির যে অত্যন্ত গুরুত্ব রয়েছে তা জানাতে লেখিকা ভুল করেননি। খ্যাতনামা চিত্রকর রবি বর্মার অঙ্কিত এক একটি চিত্র তৎকালীন সময়ে ৫০ থেকে ৬০ হাজার টাকায় বিক্রি হতো যা তৎকালীন বঙ্গ সমাজে কল্পনাও করা যেত না। শুধু তাই নয় শিষ্যদের ছবিও ৩০০ থেকে ৪০০ টাকাতে বিক্রি হয়ে থাকে। এই প্রসঙ্গে তিনি শকুন্তলার চিত্রের পরিবর্তনের কথাও বলেছেন। এখানে শকুন্তলা বনবালার পরিচ্ছদ ত্যাগ করে মহারাষ্ট্রে ললনার পোশাক পরেছেন। মুখে আধো আধো লজ্জা মাধুরি প্রকাশিত হলেও শক্তপোক্ত গড়নের শকুন্তলার পরিধান 'কাছা আঁটা কোঁচা ঝুলানো, মাথাতেও মহারাষ্ট্রী মেয়েদের মত ফুলহার জড়ানো। সবমিলিয়ে শকুন্তলার চিত্রেও মহারাষ্ট্রীয় রমণীর ছাপ সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। শিল্পরীতিতে এই পরিবর্তন উল্লেখ করে লেখিকা নিখুঁত পর্যবেক্ষণ শক্তির পরিচয় দিয়েছেন।

সামাজিক রীতিনীতি উল্লেখ প্রসঙ্গে সেখানকার মানুষের অভ্যর্থনার ধরনটিও তুলে ধরেছেন। কোন বাড়িতে বা অনুষ্ঠানে যাকে আমন্ত্রণ জানানো হয় তাকে পান সুপারি নিমন্ত্রণ করে,

সভায় নাচ গানের বন্দোবস্ত থাকে কিন্তু বাঙ্গালীদের মতো সেখানে আহারাদির কোন ব্যবস্থা থাকে না। যার উদ্দেশ্যে সভা আহুত হয় তাকে শুধুমাত্র একটি বড় রকমের ফুলের তোড়া উপহার দেওয়া হয়। বিদায় বেলায় ফুলের মালা পরিয়ে, গোলাপ জল ছিটিয়ে অভ্যাগতদের সম্মান জানানো হয়। এরকম একটি পান সুপারির নিমন্ত্রণে একজন কর্নাটির বাড়িতে উপস্থিত হওয়ার অভিজ্ঞতাটি লেখিকা সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। সুপ্রসিদ্ধ গণপতি উৎসব উপলক্ষে এই আমন্ত্রণ ছিল। অত্যন্ত ছোট ঠাকুরদালানে শিব দুর্গা গণেশ কার্তিকের মূর্তি রয়েছে । তবলা এবং হারমোনিয়ামের সঙ্গতে গান শুরু হওয়ার পর গৃহস্বামীর ১৬-১৭ বছর বয়সী গৃহবধূটি প্রবেশ করলে লেখিকারা আকারে ইঙ্গিতে তাকে বসতে বলেন। তাতেও কাজ না হলে পিঠে হাত দেওয়ায় সে থরথর করে কাঁপতে থাকে। অবশেষে লেখিকা নাচ না দেখে শুধু গান শুনেই চলে আসেন। অর্থাৎ এখান থেকে আমরা একটা কথা বলতে পারি কর্নাটিদের আতিথেয়তার রীতিটি বাঙালিদের থেকে অনেকাংশেই আলাদা। প্রাসঙ্গিকভাবে বলে রাখা ভালো এই গণপতি উৎসব মহারাষ্ট্রের জাতীয় উৎসব। লোকমান্য তিলক ১৮৯৩ সালে এই উৎসবকে মহারাষ্ট্রের জাতীয় উৎসবে পরিণত করেন। [৬]

শুধু যে লেখিকা সেখানকার মানুষজনের আতিথেয়তার বিষয়টি তুলে ধরেছেন তা নয়- তাদের বসবাসের ধরনটিও উল্লেখ করেছেন। পুনার দেশীয় বাড়ি ঘরের বর্ণনায় তিনি সেখানকার মানুষজনের অতি সাধারণ জীবন যাপনের চিত্র সুন্দরভাবে তুলে ধরতে পেরেছেন। গলি-ঘুঁজি রাস্তার ধারে অত্যন্ত ছোট ছোট দোকান ঘর আর সেই দোকান ঘরেরই আশেপাশে নির্মাণ কৌশলের বিশেষত্বে নির্মিত হয়েছে অপেক্ষাকৃত কম আলো বাতাস যুক্ত সরু সরু তিন তলা বাড়ি। এখানে পুনার সম্ভ্রান্ত লোকজনের বসবাসের বিষয়টি লেখিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ধনী লোকজনদের বড় বড় বাড়ি থাকলেও তারা সেগুলিতে বাস না করে ইংরেজদেরকে ভাড়া দিয়ে থাকেন। এই প্রসঙ্গে লেখিকা পুনার একজন সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যক্তির কথা উল্লেখ করে বলেছেন তিনি ডিউক অব কনটের জন্য রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করলেও সেখানে না থেকে দেশীয় পাড়ার একটি ঘুপচি ঘরেই থাকেন। এটিকে লেখিকা নিরহঙ্কার জীবন যাপনের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত বলেই ধরে নিয়েছেন- " পুনার ইংরাজ পাড়ার অধিকাংশ বাড়ি এখানকার বড় মানুষ লোকের । কিন্তু ময়রার সন্দেশের মত তাঁহারা অধিকারী মাত্র, ভোগ করেন ইংরাজে। হরিরাওজি নামে পুনার এক হিন্দু ধনী, ডিউক অব কনটের জন্য যে রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন, এখন তাহা খালি পড়িয়া আছে,- তবু তিনি তাহাতে বাস করেন না; সম্ভবত দেশী পাড়ার এক অন্ধকার খুবড়ির মধ্যে তাঁহার বসতি। নিঃস্বার্থপরতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত।"[৭]

পুনার ইংরেজ সমাজ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন লেখিকা। সেখানকার ইংরেজ সমাজের সঙ্গে গভীরভাবে মিশেছেন। ইংরেজদের রীতিনীতি, আচার-আচরণ, সংস্কার সমস্ত কিছুই প্রত্যক্ষ করেছেন। ইংরেজদের মধ্যে প্রবল জাত্যাভিমানের কথাও লেখিকা উল্লেখ করেছেন। পদের গৌরবে গৌরবান্বিত এই জাতির মানুষেরা 'খানাপিনাতেই অধিক বশীভূত হয় বলে স্বর্ণকুমারী দেবী মনে করেছেন। ভ্রমণের সূত্রে একটি জাতির মজ্জাগত বৈশিষ্ট্যকে লেখিকা এক গভীর সামাজিক দায়িত্ব পালন করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি ব্রিটিশ নারী সমাজের প্রতিনিধি স্বরূপ মিসেস স্নোর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। সম্ভ্রান্ত বংশীয়া এই ব্রিটিশ নারীর মধ্যে তিনি বাঙালি নারীর লজ্জা মাধুরি প্রত্যক্ষ করে মুগ্ধ হয়েছেন। ইংরেজদের চিরাচরিত সংস্কার ও তাঁর মধ্যে রয়েছে। ইংরেজরাও বার তিথি, একটা

টেবিলে তেরো জন বসে না খাওয়ার রীতি মেনে চলেন। ভ্রমণের সূত্রে এই পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে লেখিকা ইংরেজ সমাজের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যটিই তুলে ধরতে পেরেছেন। এ প্রসঙ্গে লেখিকার বক্তব্য - " আমাদের মতো ইহাদেরও যাত্রার শুভাশুভ দিন আছে। কোন অশুভ বারে কোথাও যাত্রা করিতে ইঁহার বড় ভয়, বিশ্বাস তাহাতে অমঙ্গল ঘটিবে।" [৮]

পুনার জিমখানাতে নারী পুরুষেরা ক্রিকেট, বিলিয়ার্ড, ব্যাডমিন্টন প্রভৃতি খেলাতে ব্যস্ত থাকে। তিনি এখানে নিয়মে বদ্ধ ইংরেজ সমাজেরই উল্লেখ করেছেন। ইংরেজ যুবক যুবতীরা প্রণয় ঘটিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েই জীবন কাটান। নাচ গান পাটি খেলাধুলার সূত্রে এরা পরিচিত হয়। প্রাসঙ্গিকভাবে আমরা কৃষ্ণভাবিনী দাসের 'ইংলন্ডে বঙ্গমহিলা' বইটির কথা বলতে পারি। সেখানে তিনি ইংল্যান্ডের মানুষজনের এই কুসংস্কার আচ্ছন্ন মানসিকতাকে তুলে ধরেছে। আবার ব্রিটিশ যুবক যুবতীদের প্রণয় সম্পর্কে স্বর্ণকুমারী যে কথা বলেছেন কৃষ্ণভাবিনীর বক্তব্যের মধ্যেও সেই প্রমাণ রয়েছে। এইভাবে আমরা বলতে পারি পথ আর প্রকৃতির বর্ণনায় সীমাবদ্ধ থাকেনা, তার মধ্য দিয়ে তৎকালীন সমাজ, রাজনীতি সংস্কৃতির জীবন্ত দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়- যা পরবর্তীতে কেবল সাহিত্য মূল্যে নয় ইতিহাসের রচনাকার্যে গুরুত্বপূর্ণ দলিল রূপে কাজ করে।

সোলাপুর ভ্রমণকালে লেখিকা স্বর্ণকুমারী দেবী সেখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, ওই স্থানের মানুষজনের সামাজিক রীতিনীতি বর্ণনার পাশাপাশি ধর্মীয় রীতি-নীতিটিও অতি সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। পুঙ্খানুপুঙ্খ এই বর্ণনা থেকে আমরা সেই সময়ের সোলাপুরে ধর্মীয় পরিবেশটি কেমন ছিল তা সহজেই বুঝতে পারি। সেখানকার মন্দিরগুলির সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। প্রত্যেকটি মন্দিরই পুকুরের কাছে অবস্থিত, মন্দিরের প্রয়োজনীয় জল ওই পুকুর থেকে নেওয়া হয়। পুকুরগুলি পদ্মপাতা ও পদ্ম কলিতে ভরে থাকার দৃশ্য দেখে লেখিকার মনে ভেসে উঠেছে সেই ছবি যে পদ্ম ফুল ফুটলে এই পুকুরগুলি কত না সৌন্দর্যে ভরে উঠবে তা ভেবে আনন্দিত হয়েছেন। সিদ্ধেশ্বর মন্দির এবং রেবনসিদ্ধ মন্দির প্রসঙ্গে জানিয়েছেন এগুলি দেবাদিদেব মহাদেবের মন্দির। সিদ্ধেশ্বর মন্দির দর্শন অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন- "সিদ্ধেশ্বর মন্দির নাকি বহু পুরাতন, মন্দির মধ্যে স্বর্ণমণ্ডিত মহাদেব-মূর্তি বিরাজমান। আমরা দ্বারদেশে আসিয়া দাঁড়াইলাম, একজন মহারাষ্ট্রী রমণী এক মনে আরাধনা করিতেছে দেখিলাম, বোধ করি স্ত্রীলোকটি সন্তান প্রার্থনা করে। মন্দিরের পুরোহিত একাদ্ধ নারিকেল মালা ও আর কয়েকটি খেজুর আমাদের হাতে দিলেন, তাহা দেবপ্রসাদ। পূর্বে এখানে যে স্থূলোদর-ভারে সর্পগতি, প্রফুল্ল-মুখ, অনাবরিত-গাত্র পুরোহিতকে দেখিয়া দেব দর্শনাপেক্ষা সমধিক আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম, এবার তাহাকে আর দেখিলাম না।"[৯] মতিবাগের কাছাকাছি অতি পুরাতন রেবন সিদ্ধ দেব মন্দিরেরও বর্ণনা লেখিকা অতি অল্প কথাতে ব্যক্ত করেছেন- " মন্দিরের চূড়ায় কতটা বুদ্ধের মূর্তির অনুরূপ নানা মূর্তি,- মধ্যে স্বর্ণমণ্ডিত রেবনসিদ্ধ। আমরা পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করিলাম, রেবনসিদ্ধ মানে কি? সে বলিল, মহাদেব।"[১০] সিদ্ধেশ্বর, রেবনসিদ্ধ মন্দির ছাড়া এই শহরটিতে মন্দিরের সংখ্যা খুব বেশি নেই বলে লেখিকা জানিয়েছেন। রাস্তাঘাটে বড় বড় শিলাখণ্ডে তেল সিঁদুর মাখিয়ে দেবতা বানিয়ে পূজা করে, গভীর ভক্তি মিশ্রিত এই পূজার্চনার মধ্যে শিলা পূজার রীতিটি পরিস্ফুট হয়েছে। এর থেকে সোলাপুরের মানুষজনের ধর্ম প্রাণতার দিকটি অতি সহজেই ধরা পড়ে। লেখিকা আরো জানিয়েছেন শৈব ধর্মাবলম্বীরা, রুপোর তৈরি বড় বড় কবচ সুতোয় পরে থাকেন। বুকের উপরে এই

সব তাবিজ দেখে যে কোন মানুষ তাদের পরিচয় সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারেন। মৃত্যুর পর শৈবদিগকে দাহ না করে সমাধিস্থ করার রীতি প্রচলিত রয়েছে বলেও উল্লেখ করেছেন। আবার পুরোহিতেরা সরকার থেকে বছরে ৪০ টাকা করে বৃত্তি লাভ করে থাকেন।

হিন্দুদের ধর্মীয় রীতি-নীতির উল্লেখ করার পাশাপাশি পারসীদের মৃতদেহ সৎকারের রীতিও উল্লেখ করেছেন। লেখিকারা তিনজন মিলে পারসীদের সমাধি মন্দির দেখতে যান । এখানে তিনি ফাঁকা মাঠে ইঁট দিয়ে তৈরী গোলাকার সমাধিমন্দির দর্শন করেন। তবে ওই সমাধি মন্দিরে পারসী ভিন্ন অন্য সম্প্রদায়ের মানুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ হওয়ায় তাঁরা সেখানে প্রবেশ করতে পারেননি। তবে লোকমুখে শুনেন ওই সমাধি মন্দিরে স্ত্রী, পুরুষ এবং শিশুদের জন্য পৃথক জায়গা নির্দিষ্ট করা আছে। মৃতদেহ রেখে কপাট বন্ধ করার পর বড় বড় গাছে থাকা শকুনি, গৃধিনীদের দল মৃতদেহ উদরস্থ করার পর মানুষজন সেই স্থানটি পরিষ্কার করে। এই রীতিকে লেখিকা প্রথমে হৃদয়হীন মনে করলেও হিন্দু সৎকার রীতির উল্লেখ করে পারসির রীতিকে অনেক বেশি ধর্মপ্রাণ বলে মনে করেন- " পারসীদিগের এই শব প্রথায় আমরা শিহরিয়া উঠি; ইহাতে পারসীদিগকে নির্মম হৃদয়হীন বলিয়া বোধ হয়। অথচ ভাবিয়া দেখিতে গেলে, দাহ প্রথাতে কি বিশেষ হৃদয়ের পরিচয় প্রদান করে? যাহাকে চিরদিন যত্নে রাখিয়াছি, পূজা করিয়াছি, সে ভালোবাসার বস্তুকে ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া মুচড়াইয়া মুচড়াইয়া অগ্নি দগ্ধ করিতে যাহারা পারে- তাহারা কি কম নিষ্ঠুর? স্তব্ধ- নিবাসের শকুনি গৃধিনীগণ মানব নয়নের অসাক্ষাতে গোপনে গোপনে ভঙ্গ করে, আর চিতাশায়ীর সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম ব্যক্তি,- তিনি তাহার মুখে অগ্নি প্রদান করেন; আর প্রিয়জনের আঘাতে তাহার সম্মুখে সেই দেহ ক্রমে অগ্নিসাৎ হইতে থাকে। কেবল তাহাই নহে; পারসীদিগের মনের এক শান্তি,- মৃত্যুর পর তাহার প্রিয়জনের প্রিয় দেহ অন্যের উপকারে আসিয়াছে!"[১১] মৃতদেহ সৎকারের সঙ্গে পরোপকারের বিষয়টি তুলে ধরে লেখিকা সচেতন মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। মৃতদেহ সৎকারের সঙ্গে ধর্মীয় রীতি-নীতির পাশাপাশি মনুষ্যেতর প্রাণীর সেবায় পুণ্য অর্জনের বিষয়টি স্বর্ণকুমারী ছাড়া অন্য কোন লেখিকা উল্লেখ করেননি। এখানে ঠাকুর পরিবারের নারীর মানবতাবাদী মনন উপলব্ধি হয় যে যৌক্তিক বোধে যেকোনো সংস্কারের ভালো-মন্দ বিচার করতে পারেন।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা একথা বলতে পারি স্বর্ণকুমারী দেবীর পত্র শিরোনামাঙ্কিত ভ্রমণ কাহিনীটিতে লেখিকা সোলাপুর অঞ্চলের সমকালীন সময়ের সামাজিক রীতিনীতি ও ধর্মীয় রীতিনীতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়ে এক ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছেন। এই ভ্রমণ কাহিনি পাঠ করলে অতি অনায়াসেই সমকালীন সময়ের সোলাপুরের এক উজ্জ্বল চিত্র খুঁজে পাওয়া যাবে। লেখিকার এই বর্ণনা প্রমাণ করে একজন ভ্রমণ সাহিত্যিকের ভ্রমণ অভিজ্ঞতা কেবলমাত্র সাহিত্যিক গুণে সমৃদ্ধ নয় তা সমাজ ও ইতিহাসের জীবন্ত দলিল।

তথ্যসূত্র :

১. গুপ্ত, শ্যামলী, ' বঙ্গনারীর প্রগতি প্রবাহ' ,ন্যাশনাল বুক এজেন্সী ,কলকাতা,প্রথম প্রকাশ ২০১২,
২. Brown, K. Christopher, 'Encyclopedia of Travel Literature', ABC Clio, Oxford, London, 2000, p.138

৩. Ibid., p.35

৪. Speake Jenifer, 'Literature of Travel and Exploration and Encyclopedia (Vol.3) ', Fitzory Dearborn, New York, London, 2003, P.1285

৫. Turner Katherine ,'British Travel Writers In Europe1750 1800', Ashgate,Aldershot, 2001, P.128

৬. https://drishtibhongi.in/2023/08/01/bal-gangadhar-tilak-ganesh-puja-Independence 06.11.2023

৭. দেবী স্বর্ণকুমারী, 'পত্র',রচনা-সংকলন,দে'জ,কলকাতা,প্রথম প্রকাশ, ২০০০, পৃষ্ঠা ৩১৯ তদেব,পৃষ্ঠা ৩৩৮

৮. তদেব,পৃষ্ঠা ৩১০

৯. তদেব,পৃষ্ঠা ৩১১

১০. তদেব,পৃষ্ঠা ৩১১